Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 810 - 817
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথায় ‘প্রগতি’ পত্রিকা

শেখ রফিজুল
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : rafijulrkmv01996@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Memoirs, Buddhadev Basu, Pragati Patrika, Jibanananda, Institutions.

Abstract
Buddhadev Basu himself became an 'institution', and the reason behind this 'institution' was editing the magazine. Although he had been involved in magazine editing since childhood, it was 'Pragati' magazine that gave him a different world in literature. This magazine became a field for his own literary practice as well as a place for young writers of that time. Buddhadev Basu found Jibanananda Das here. Buddhadev, fascinated by Jibanananda's poetry, waged a kind of war in 'Pragati' to establish him in the literary community. Buddhadev also discovered not only Jibanananda, but Vishnu Dey here. In a word, Pragati magazine is an important chapter in Buddhadev Basu's life. And he looks back on this chapter in the twilight of his life, and has retained it in his memoirs for future readers.

Discussion

‘মানুষটি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান’ – এই উক্তিটি আমরা যখন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে বলে থাকি তখন আমরা ওই ব্যক্তির সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়েই করি। ‘প্রতিষ্ঠান’ এমন এক সমবায়িকতা যেখানে একাধিক সমমনস্ক মানুষ একত্র হয়ে এমন কোনো কর্ম-প্রবাহের সম্পাদনা করেন যা অনেককে আকর্ষণ করে, সহায়তা করে, এমনকি অনেকের মনের ভেতর জাগিয়ে তোলে শক্তিকে। সেই কর্মপ্রয়াস এমন একটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে – যিনি বা যাঁরা সে কর্মপ্রয়াসের উৎস মুখ – তাঁর বা তাঁদের সময়ের পরও সেই কর্মের স্রোত ও সুফল-সমূহ সমৃদ্ধ করে অনেক মানুষকে। এই অর্থেই আমরা কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং প্রতিষ্ঠান বলে সম্মান জানাই। হয়তো সেই মানুষটি সেই অর্থে কোনো সঙ্ঘই গড়ে তোলেন নি। নিজের মনের মতো করে মননের চর্চা করে করে গেছেন কোনো বিষয়ে। কিন্তু বিষয়ের গভীরতা, মননের চর্চার বিস্তার এততাই যে, অনেকে তাঁর কাছে আসেন, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ পেয়ে উপকৃত হন; তাঁর আদর্শের ধারাকে সামনে রেখে নিজেরা কাজ করবার প্রেরণা পান। সমবায়ী প্রয়াসে গড়ে ওঠা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সব সময়েই খুব বড়ো মাপের না হতেও পারে, তা হতে পারে কোনো স্বল্পজীবী পত্রিকা - যা পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন দিক থেকে। অথবা কোনো আড্ডা - যেখান থেকে মনের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক মানুষ। সেই সময়ে সেই আড্ডার বা পত্রিকার গুরুত্ব খুব একটা বোঝা যায়নি কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিকথায় তার গুরুত্ব বোঝা যায়। এমনই এক ‘প্রতিষ্ঠান’ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তাঁর সাহিত্য সাধনা ও পত্রিকা সম্পাদনাকে কেন্দ্র করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে তরুণ বয়স থেকেই 'প্রতিষ্ঠান' হয়ে ওঠার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। যদিও শিশু বয়স থেকে মাতৃহীন ও পিতৃসঙ্গ -বঞ্চিত, তবুও মাতামহ ও মাতামহীর স্নেহানুশাসনে শিক্ষাজীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের রাজ্যে নিজে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন এবং সেই মনরাজ্যে বিচরণের পরিধি তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে একাগ্র মেধা-উজ্জ্বলতা এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারফলে তাঁর প্রতি বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী কিশোর তরুণরা আকর্ষিত হতেন। বুদ্ধদেব কিশোর বয়স থেকেই যখনই কোনো কাজ করার কথা ভেবেছেন, কাজে হাত দিয়েছেন তখন সংখ্যায় অল্প হলেও অনুগামী অনুরাগীরা তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। বন্ধু, পত্নী, কন্যা, অনুরাগীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তাঁর মধ্যে মানুষকে আকর্ষণ করার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। চারিদিকে থাকা মানুষদের কেন্দ্রে বিরাজ করতেন তিনি। এ কোনো সচেতন প্রয়াস নয়, এ আকর্ষণ জন্ম নিত তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি থেকে। যাঁরা পরবর্তীতে ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবেন তাঁদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের দ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তাই তো ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ - এর বাড়িটি হয়ে উঠেছিল 'কবিতাভবন' নামের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সে তো অনেক পরের ঘটনা, ১৯৩৭ সালের। তারও অনেক আগে বুদ্ধদেব বসু যেখানেই থাকতেন সেই জায়গায় তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হত, মন-মনন-হৃদয় জুড়ে ঘণীভূত হত সাহিত্যপ্রেমের বাতাবরণ।

বুদ্ধদেব বসু যখন স্কুলের বালক ছিলেন তখন থেকেই লেখা ও পত্রিকার প্রেমে ছিলেন পাগল। বিভিন্ন পত্রিকা (যেমন, 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সন্দেশ') নিয়ে মাতোয়ারা, তেমনি 'মৌচাক' নিয়েও আগ্রহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু 'মৌচাকে' লেখা প্রকাশ করার জন্য বারবার লেখা পাঠাতে থাকলেও তা যখন সম্পাদকের নির্বাচনের তালিকায় ঠাঁই পায় না তখন সম্পাদককে 'পক্ষপাতদোষে দুষ্ট', বাইরের লোকের লেখা ছাপেন না, বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে চিঠি পাঠান। এই চিঠির তীব্র নিন্দা করে লেখা বেরোয় 'মৌচাকে'র পরের সংখ্যায়, যা বুদ্ধদেব বসুকে অনেকটা পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু 'আমার ছেলেবেলা'তে লিখছেন -

> "*মৌচাকের* পরের সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সেই চিঠির তীব্র নিন্দা বেরোলো, প্রায় আস্ত এক পৃষ্ঠা জুড়ে, পত্রলেখকের নামটি অবশ্য উহ্য রেখে। আমি মাথা পেতে নিলাম সেই শাস্তি, কাজটা খুব অন্যায় হয়েছিলো তা বুঝে নিতে আমার দেরি হল না। তেমনি আমি রইলাম *মৌচাকের* দ্বারা মুগ্ধ হয়ে - যতদিন না আমার যৌবনের শুরুতে, সেই শিশু-পত্রিকাটি আমার জীবন থেকে খসে পড়লো - কিছুকালের মতো।
>
> এই কাহিনীর একটি সুখের উপসংহার আছে। আমার সাহিত্যিক জীবনে যে-কটি মানুষকে আমি সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসেবে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সুধীনচন্দ্র সরকার - সেই সম্পাদকমশাই, যিনি আমার ছেলেবেলার অশিষ্টতাকে সুযোগ্যভাবে শাসন করেছিলেন। আমার কুড়ি বছর বয়স থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ অটুট ছিল।"[১]

এমনই মনের দুর্বার গতি ছিল লেখা প্রকাশ করার। তা যে কেবল ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, অনেক পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, এই লেখা প্রকাশ করার যে অন্যতম নির্ণায়ক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তা তিনি অনুভব করেন। তার জন্য তাঁর যে ব্যগ্রতা - যা তাঁর প্রতিষ্ঠান মনস্কতার পরিচয়ও বটে। পত্রিকাই সেই মঞ্চ - যা একজন সম্পাদক সম্পাদনা করলেও এবং লেখকেরা একা একা লিখলেও তা সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই স্কুলে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকার সম্পাদক রূপে থাকেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি তাঁর 'আমার ছেলেবেলা'তে লিখছেন -

> "ততদিনে আমি এক-ঝুড়ি-ভর্তি কবিতা আর গল্প-প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি; 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিকপত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার; ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা *তোষিণী*তে আমার লেখা বেরিয়েছে, আর বর্জইস অক্ষরে কলকাতার *অর্চনায়*, এমনকি শ্বেত-পীত মলাটধারী সম্ভ্রান্ত চেহারার *নারায়ণে*ও।"[২]

আর 'ক্ষণিকা' নামের দুটি ক্ষণজন্মা পত্রিকা-প্রয়াসের পালা সাঙ্গ করে ১৯২৫-এ তিনি বার করলেন হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা। সঙ্গী ছিলেন টুনু অর্থাৎ পরবর্তীকালের কবি, অধ্যাপক, গবেষক অজিত দত্ত। সঙ্গে আরও ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য, প্রভু গুহঠাকুরতা, ভৃগু গুহঠাকুরতা, পরিমল রায় প্রমুখ। এই বন্ধুরা সবাই একই সময়ে আসেননি কিন্তু এক সময় এসেছিলেন, দিয়েছিলেন মানসিক সঙ্গ। তাই হাতে লেখা 'প্রগতি' ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে ছাপার অক্ষরে প্রস্ফুটিত হল। শুঁয়োপোকার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক প্রজাপতি। অল্পসময় জীবিতকাল বলে তা উপেক্ষণীয় নয়; এই অল্পসময়ে 'প্রগতি' অনেক দীর্ঘজীবী পত্রিকার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গিয়েছে। তাই তো 'প্রগতি' একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমি রূপে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি পত্রিকা চালানোর জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সমমনস্ক-সম্পন্ন কয়েকজন মানুষের, যা সেই পত্রিকার উদ্দেশ্যকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। 'প্রগতি'র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সাহিত্যচর্চা করা যেমন তেমনই আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের একটা জায়গা করে দেওয়া। 'প্রগতি' প্রথম থেকেই এই লক্ষ্য পূরণ করেছিল। মাসে একশো টাকা হলেই একটা পত্রিকা চালানো যায়, সেই অর্থ সংগ্রহ করতে সমমনস্ক বন্ধুদের অভাব হল না, যাঁরা মাসে দশ টাকা করে দিয়ে 'প্রগতি'র চলার পথ সুগম করে দিয়েছিল। প্রগতির আবির্ভাবের ক্ষণটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর *আমার যৌবন* স্মৃতিকথায় -

> "আর দ্বিতীয় বৃত্তিটি ঢাকা বোর্ড মাত্র সে-বছর থেকেই মঞ্জুর করেছিলেন। তা দৈব হোক আর যাই হোক, মাসিক কুড়ি টাকা মানে মাসিক কুড়ি টাকাই; - বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেল, হস্তলিপি- পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র নিঃসৃত দস্তুরমাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোনো এক দিনে আমার এবং টুনুর যৌথ সম্পাদনায় - এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে - *প্রগতি*র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে ঊর্ধ্বমুখ একটি নারীমুণ্ড আঁকা ... প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল, মনে পড়ে বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিলো। একদিকে এই পত্রিকা চালাবার উত্তেজনা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জীবন - আমার দিনগুলি দুই ধারায় উচ্ছল বয়ে যাচ্ছে।"[৩]

এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দ্রুত একত্রিত হলেন তরুণ লেখক-গোষ্ঠী। *প্রগতি*র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বিজ্ঞাপনে যে লেখকরা ছিলেন সুশীলকুমার দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জসীমুদ্দিন, বুদ্ধদেব বসু, মোহিললাল মজুমদার, যুবনাশ্ব, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দশগুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, হেমচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। এই লেখক-গোষ্ঠীর তালিকা দেখে অনুমান করা যায় কত ঈর্ষণীয় ছিল *প্রগতি*র লেখক তালিকা। তারপর দু-বছরের কিছু বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (১৯২৯)।

একটি প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা বা আড্ডার সঙ্গে অনিবার্য ভাবেই একটি স্থানের নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কোনো বাড়িতে, চা -এর দোকানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বা অনুরূপ কোনো স্থানে মিলিত হবার জায়গা থাকলে প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা বা আড্ডাটি বেশ জমাট হয়। 'প্রগতি' পত্রিকার জন্ম ও জায়মানতার তেমন এক স্থানের ভূমিকা ছিল। পুরানা পল্টনের টিনের ঘর এই সূত্রেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসুর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মাতামহী স্বর্ণবালা তার ভাইয়ের সাহায্যে ঢাকার 'পুরানা পল্টন' এলাকায় একটি ইঁটের প্রাচীর দেওয়া টিনের ঘর তুললেন। তুলসীমঞ্চ, অপরাজিতা ও লজ্জাবতীলতা, বটগাছে পাখির ডাক, ফাঁকা মাঠ, খোলা আকাশ, দূরন্ত হাওয়া আর ধ্বনিবহুল উচ্ছৃঙ্খল অজস্র বর্ষার অপূর্ব মিশ্রণে বাড়িটি পরিপূর্ণ। এই বাড়িটি শুধু একটি বাড়ি নয়, একজন মননশীল, অনুভূতিপ্রবণ সাহিত্যিক তৈরিতে প্রভাব ছিল বিস্তর। বুদ্ধদেব বসু লিখছেন -

> "পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে আমি ছ-বছর কাটিয়েছি - সমস্ত কলেজ-জীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ। এ-সময়টা আত্মপ্রকাশের না-হলেও আত্মপ্রস্তুতির দিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> থেকে জীবনের সবচেয়ে প্রধান অংশ। এ-সময়ের পরিণতিতেই মানুষের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ নির্দিষ্ট হয়। বন্ধুতা স্থাপন করবার, অন্তর্জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করবার, রুচি ও অভ্যাস গঠন করবার এই সময়। ... শেষ পর্যন্ত আমরা যে-কয়টি বন্ধু একত্র হয়ে 'প্রগতি দল' বলে পরিচিত হলাম, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই সেইরকম সময়েই আলাপের সূত্রপাত।"[৪]

আর এই বাড়িতেই 'প্রগতি'র পথ চলা শুরু হয়েছিল। অনেক বন্ধু, প্রচুর আড্ডা, বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে মতবিনিময়, মুগ্ধতা, বিতর্ক, সেই সঙ্গে নিজেদের সাহিত্যচর্চা।

> "তারপর রাত জেগে-জেগে সব কাজ করতে হতো; 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা, 'প্রগতি'র পাতা ভরবার জন্য 'কপি' তৈরি করা, আরো নানারকম লেখা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতাম না; একটা দিন কেটে যেতো এক মুহূর্তের মতো। দিনগুলো যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি, একটু বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। বন্ধুদের ভালোবাসা, সাহিত্যে দুরন্ত উৎসাহ, নতুন সব জিনিশ লেখা, কল্পনার প্রসার, বিচিত্র বাসনার জাগরণ, জীবনের উপভোগে ক্লান্তিহীন আগ্রহ - যদি কখনো একটু অবসর পেতাম, বিস্মিত মন প্রশ্ন করতো : এ কি সত্যি ? এ কি সত্যি ? বছর দুই সময়ের মধ্যে আমার মন সৌন্দর্যে সাহসে দুরাশায় আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো। তারপর - তার পরের কথা বলে লাভ নেই; কী যেন হল, 'প্রগতি' উঠে গেলো, বন্ধুতার নিবিড় বন্ধন যেন শিথিল হয়ে এলো।"[৫]

আসলে 'প্রগতি' শুরুর সময় যে হৃদয়াবেগ ছিল বা সংসার সম্পর্কে যে উদাসীনতা ছিল তা পরবর্তী সময় বজায় রাখা অনেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ একদিকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তা অন্যদিকে আর্থিক অনটন তাঁদেরকে স্থিত হতে দেয়নি। যত সুন্দর মন নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি না কেন সময়ের সাথে সাথে সংসারের ছাপ তাতে পড়বেই। এই পরিস্থিতির স্মৃতি বুদ্ধদেব তাঁর 'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> "শেষে কী হল একটু বলে রাখি। প্রথম সংখ্যা কাগজ বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের দশজনের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনাচক্রান্তে কে কোথায় ছিটকে পড়লো - পরে আর তাদের পাত্তা পাওয়া গেলো না। কেবল দু-জনের কাছ থেকে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছিলুম। কিন্তু মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিকপত্রের অগ্নিসংযোগে আশ্চর্য দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো। ('প্রগতি'র যা বার্ষিক আয়, তাতে ঠিক এক সংখ্যা কাগজ ছাপা হতে পারতো।) এমন অবস্থায় মাসিকপত্রের মতো প্রচণ্ড শখ মিটতেও বেশি দিন লাগে না, অকস্মাৎ মধ্যপথে 'প্রগতি'র গতি গেলো থেমে।"[৬]

'প্রগতি' পত্রিকা মাঝপথে থেমে গেলেও অল্প সময়ের মধ্যে নিজের করণীয় কাজ অনেকটা সম্পন্ন করতে পেরেছিল। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা দিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন 'প্রতিষ্ঠান' বলছি তার কিছু কারণ আছে। 'প্রগতি'র আগে প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল' (১৯২৩), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২১), 'উত্তরা' (১৯২৫) এবং 'প্রগতি'র সঙ্গেই 'বিচিত্রা'। 'কল্লোল' ছাড়া আর প্রায় সব পত্রিকাগুলিতে নতুন লেখকদের আবির্ভাব ঘটলেও প্রথাসিদ্ধ পরম্পরাকে অস্বীকার করবার শৈল্পিক ঔদ্ধত্য ছিল না। সব ধরণের লেখাকেই স্থান দিতেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত উপস্থিত ছিল অধিকাংশ পত্রিকায়। এমনকি 'কল্লোলে'ও রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। অর্থাৎ আধুনিকেরা থাকতেন প্রথাসিদ্ধ সাহিত্য ধারণার সঙ্গে সহাবস্থানে। কিন্তু 'প্রগতি'র সম্পাদকের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্ত আধুনিকতার যে লক্ষণগুলো পাশ্চাত্য সাহিত্য দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে সেগুলোর সমর্থনে মত প্রকাশ করা। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' ছিল নবীন সাহিত্যের প্রসারক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'প্রগতি' পত্রিকার স্থান একটু স্বতন্ত্র। 'প্রগতি' নবীন সাহিত্যের প্রসারকই নয়, প্রচারকও। 'প্রগতি'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'মাসিকী'তে 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মাসিকী' শীর্ষক ছাপা হত এবং লেখকের

নামের আদ্যক্ষর দিয়ে চিহ্নিত হত - 'প্রগতি' পত্রিকার নামটির তাৎপর্য ও নবীন সাহিত্যের লক্ষণগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলা আছে। মাসিকীটি অ. স্বাক্ষরবাহী। লেখক অবশ্যই অজিতকুমার দত্ত। তবে বক্তব্য নিশ্চয়ই যৌথ ও সর্বসম্মত।

> "বাংলা সাহিত্যের এই নবীনভাবধারাকে ("আজকের দিনে বালাদেশে যে একটি বিশিষ্ট তরুণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে এ-কথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই") আমরা তা'র সকল অপরাধ- সহ বরণ করে নিলাম।... সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার যত প্রয়োজন তেমন বুঝি আর কোথাও নয়। সেই স্বাধীনতার জন্যই এই বিদ্রোহ, সেই মনের কথা খুলে' বলবার অধিকারটুকুর জন্য। এই বিদ্রোহকে, সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহণ করেছি, তাই আমাদের মুখপত্রের নাম 'প্রগতি'।"[৭]

'কল্লোল' ও 'কালিকলমে' যে মনোভাব নিরুচ্চারিত অথচ প্রতিফলিত ছিল সেই মনোভাব 'প্রগতি' পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিষ্ঠভাবে অভিব্যক্ত। এই রচনায় নবীন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও নবীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পত্রিকার ভূমিকা সবই বলে দেওয়া হল। এইটেই হলো প্রচারকের কাজ। পত্রিকা চালাতে গিয়ে কিছু প্রথাসিদ্ধ লেখা হয়তো নিতে হয়েছে তাঁকে কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল বা সচেতন প্রয়াস ছিল আধুনিক ভাবধারার লেখাকে প্রকাশ করা ও এই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

তাই বারবার তিনি 'প্রগতি'তে জোর দিয়ে রবীন্দ্র-অনুকরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকেন। তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অসম্মান করেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে পরবর্তী সাহিত্যিকরা যাতে আটকে না পড়ে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল বুদ্ধদেবের। এ বিষয়ে 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পর্কে তাঁর উক্তি -

> "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি একটি অতি আবশ্যক বোঝাপড়ার চেষ্টাও সেখানেই আমরা প্রথম করেছিলাম। বোঝাপড়া - মানে, এমন কোনো ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক আমাদের দিক থেকে প্রস্তুতি, যাতে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জালে আমরা আটকে না থাকি চিরকাল, তাঁকে আমাদের পক্ষে সহনীয় ও ব্যবহার্য করে তুলতে পারি। লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবীন্দ্র-বিদ্রোহ,..."[৮]

সমকালীন অন্যান্য পত্রিকাতেও নতুন ভাবধারার লেখা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র-অনুকরণে সাহিত্য রচনার বিপক্ষে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। 'কল্লোল' ও 'প্রগতি'র লক্ষ্যের তফাৎ হয়ত বিশেষ ছিলনা - কিন্তু 'কল্লোলে'র কণ্ঠস্বর এতটা উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিলনা। কল্লোল বা সমগোত্রীয় পত্রিকাগুলি নতুন ভাবধারার লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সাহিত্যকেও গ্রহণ করে চলতে থাকে। এরই পাশাপাশি, 'প্রগতি' জানত তারা কী করছে, কী করতে চায় বা কেন করবে। শুধুমাত্র কীভাবে করবে সেই রণনীতি বা ব্যূহসজ্জায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলনা তারা। আর তাই অভিমন্যুর মতো প্রবেশ করেছিল চক্রব্যূহে। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে উন্মুখরতার ফলে একদিকে যেমন শক্তিক্ষয় হয়েছিল তাঁদের, তেমনি অসহায়ভাবে তাঁরা আবিষ্কার করেছিল তাঁদের সুহৃদ্হীন সামাজিক স্থিতি। কিন্তু যৌবনের এই অমিতব্যয়ী তেজ থেকেই সমকালীনতার উত্তাপ পেয়েছিল 'প্রগতি'। এবং পেয়েছিল সাহিত্যেরই প্রয়োজনে, সাহিত্য রুচিরক্ষার উৎকণ্ঠা থেকেই। এমন উৎকণ্ঠার বিপরীত পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল যে অসুয়াকাতর, স্থূলপ্রকাশ, সৃজনদুঃস্থ কোন পত্রিকাগোষ্ঠীতে, তার থেকে তৃপ্তিকর বৈপরীত্যে নিজেদের স্থাপন ক'রে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোলে' প্রকাশিত কবিতা—

> "সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!"[৯]

এই কবিতাটির ভাবকে বুদ্ধদেব বসু যুক্তিতে, বিশ্লেষণে, তর্কে, বিভিন্ন লেখায় প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিল 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায়।

'প্রগতি'তে 'মাসিকী' নামে একটি বিভাগ থাকতো। সেখানে বুদ্ধদেব বসু নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। সেখানে লিখেছিল,

> "অধুনা বাংলা সাহিত্যে একটি পরম বিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব-রসের আস্বাদ বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করবার ভার *প্রগতি* নিয়েছে।"[১০]

তিনি শুধু দায়িত্ব নেননি, সেই দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য অনেকের সঙ্গে তর্কে যেতে হয়েছে, তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। জীবনানন্দের আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বারবার 'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দের কবিতা ছেপেছেন। তাঁর কবিতার নবীনত্ব, ভাষা, উপমা ব্যাখ্যা করে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন 'প্রগতি'র পাতায় -

> "জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়। ... তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট ক'রে ভালো কি মন্দ বলা যায় না- তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চ'লে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ...
> এ-কথা ঠিক যে তিনি (জীবনানন্দ) পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিশেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। ... জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধ'রে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান; ... সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো। ... (সেইজন্যেই) আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে।"[১১]

তাছাড়া 'আমার যৌবন' স্মৃতিকথায়ও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই পত্রিকাতেই যে বুদ্ধদেব নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন ও নিজের সাহিত্যিক আদর্শ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তা বারবার করে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন। 'প্রগতি' অন্যান্য পত্রিকা থেকে আলাদা তা তিনি 'আমার যৌবনে' প্রকাশ করেছেন-

> "*প্রগতি*র প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা পৃষ্ঠাজুড়ে থাকে সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ - *কল্লোলে* যে-জিনিসটি কখনো স্থান পায়নি, বা উল্লেখ্যভাবে স্থান পায়নি। এই বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুষ্প্রাপ্য, আমিই লিখি মাসে-মাসে প্রায় পুরোটা - অনিচ্ছায় নয়, বরং সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে। সাহিত্য বিষয়ে আমার একটা অনুভূতি আছে, সেটা তীব্র এবং প্রকাশের জন্য উৎসুক, এদিকে সেই সময়টাও ছিলো বিশেষভাবে তর্কমুখর। অলিতে-গলিতে রব তুলছে আমাদের নিন্দুকেরা, দু-একটা সুশ্রাব্য কথাও আমাদের কানে আসছে মাঝে-মাঝে; ব্যাপারটা আমার মন্দ লাগছে না, আমার ছেলেমানুষি অহমিকায় ঈষৎ সুড়সুড়ি দিচ্ছে এই ভাবনাটা যে আমরা এতদূর মনোযোগের যোগ্য। আমি দুই হাতে ছড়িয়ে যাচ্ছি পাল্টা জবাব-শুধু শত্রুপক্ষের প্রতিবাদ হিসেবেই নয়, আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে বলেও। আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিষ্কুণ্ঠ; এক পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে পথ চলাও আমার স্বভাবে নেই। আমার সে-সব লেখায় দাপাদাপি একটু বেশি ছিলো, গদ্য ছিলো ইংরেজি বকুনি-মেশানো, নড়বড়ে; কিন্তু কাঁচা লেখাও কখনো কোনো কাজে লাগে না তা নয়, কোনো বিশেষ মুহূর্তে মুহূর্তের কথাও সবীজ হতে পারে, খুব উঁচু করে নতুনের নিশেন উড়িয়ে দেবারও প্রয়োজন ঘটে কখনো। প্রগতির জন্য এটুকু অন্তত দাবি করা যায় যে সেই দূর সময়ে, যখন 'গণ্ডার-কবি'কে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।"[১২]

শুধু জীবনানন্দ নন সেই অজানা অখ্যাত বিষ্ণু দে-কেও তিনি প্রথম পান 'প্রগতি'র পাতাতে। সেখান থেকেই বিষ্ণু দে'র সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সখ্য স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপালের সাহিত্যিক, মানসিক মিলনস্থল 'প্রগতি'। বুদ্ধদেব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন —

> "তখনও নাম-না-জানা উজ্জ্বল লেখকও আমাদের ভাগ্যে একজনকে আমরা পেয়েছিলাম : তিনি বিষ্ণু দে।
>
> বিষ্ণু দে প্রথম দু-একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল রায়' বা অমনি কোনো ছদ্মনামে, তারপর স্বনামে পাঠালেন আড়াই পৃষ্ঠার একটি কবিতা ('ডলুটা যখন ন্যাকামি করে')-কথ্যভাষায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে সুস্বাদু হালকা চালে হাসির ছটায় চমক-লাগানো। এর পরে 'ট্রিয়োলেট-গুচ্ছ', কিছু গদ্য রচনা-কোনো-এক সময় তাঁর দুটি গল্পও বেরিয়েছিলো, মনে পড়ে। কৌতুক এই, মিতাক্ষর 'বিষ্ণু দে' নামটিকেও অনেকে প্রথমে ছদ্মনাম বলে ধরে নিয়েছিলেন।"[১৩]

শুধু নতুন কবিদের নতুন ধরনের কবিতাই প্রকাশ ও প্রচার করেননি, নতুন স্বাদ ও শৈলির গল্প লেখার ও লিখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু এই পত্রিকার পাতায়। সমকালীম পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঘটনা প্রবণ গল্পের পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে আত্মকথন ও প্রতীকী গল্পের বয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজে মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, গন্তব্যহীন যাত্রা, অবিশ্বাস মানুষ ও দেবতাকে; এই অনিশ্চয়তার চেহারা ফুটে উঠছে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যে তেমনি 'প্রগতি'র পাতায়। 'শ্যামল রায়' ছদ্মনামে বিষ্ণু 'প্রগতি'র পাতায় এই ধরনের কিছু গল্প লিখেছিলেন। যদি 'প্রগতি' স্থায়ী হত তাহলে এই নতুন রীতি এখানে দৃঢ় হত। তার জন্য আমাদের তিন দশক অপেক্ষা করতে হত না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় বাঙালি সাহিত্যিকরা কেবল ইংরেজি সাহিত্য নির্ভর চর্চা তাঁরা করলেন না, তাঁদের দৃষ্টি পড়ল ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্যের ওপর। এই আগ্রহের জাগরণ প্রমথ চৌধুরী ঘটালেও আলোচনা, অনুবাদের মধ্য দিয়ে 'কল্লোল'ই ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে এনে দিয়েছিল পাঠকের কাছাকাছি। আর বুদ্ধদেব বসু ইউরোপীয় সাহিত্যে অনুরাগী। তাই তিনি 'প্রগতি'র পাতায় ছাপতে লাগলেন অনূদিত কবিতা, গল্প। বিদেশি সাহিত্য নিয়ে লেখা হয়েছে প্রবন্ধ। রুশ কথাসাহিত্য ও জাপানের কবিতা অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে।

'প্রগতি'র ভূমিকা এখনকার সময় থেকে দেখলে মনে হয় ক্রান্তিকরী। তরুণের এই অভিযান বাহ্যত ব্যাহত হ'ল অর্থের অভাবে, কিন্তু জুগুপ্সাপরায়ণ সাহিত্যব্যাপারীদের অরুচিকর কুৎসাপ্রচার হয়ত ভেতরে-ভেতরে ক্লান্ত ক'রে তুলেছিল সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং সম্পাদককেও। পত্রিকা বন্ধ করার দুঃখের মধ্যেও এই তৃপ্তির স্বাদটুকু র'য়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। কোন সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা, সাহিত্যের ইতিহাসে তার যে উজ্জ্বল উদাহরণগুলি আমাদের জানা আছে, নিতান্ত স্বল্পায়ু হলেও 'প্রগতি'কে তার অন্তর্ভূক্ত করা চলে। পত্রিকাটি যেমন বুদ্ধদেব বসু সৃষ্টি করেছেন তেমনি এই পত্রিকাই বুদ্ধদেব বসুকে সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধদেব বসু নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, নিজের সাহিত্য জীবনের পূর্ণ সূচনা ঘটিয়েছেন। নিজে যেমন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন তেমনি একদল তরুণকে এই পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু আত্মবিস্তৃতির রাস্তা করে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যে, সম্পাদকের একটি আনন্দপ্রদ কর্তব্য থাকে তা হল - নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করা ও সাহিত্য-সমাজে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের প্রতিভা কারোর পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু আত্মবিস্তৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেলে তা শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই *প্রগতি*কে বাহন করে তাঁর উদ্দেশ্যের ঘোড়াকে ছুটিয়ে ছিলেন। মাত্র দু'বছর তিন মাসের আয়ুর মধ্যেই এই পত্রিকা নিজে একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। যাকে ছাড়া বাংলা বিশ শতকের সাময়িক পত্রিকার আলোচনা অসম্ভব।

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার ছেলেবেলা, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, প. ৩৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 810 - 817
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. তদেব, পৃ. ৩৭

৩. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৭৮

৪. *পুরানা পল্টন*, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা - ২০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯/ ফাল্গুন ১৪১৫, পৃ. ১৮৮-৮৯

৫. তদেব, পৃ. ১৯৩

৬. তদেব, পৃ. ১৯২

৭. প্রগতি, *মাসিকী,* ১৯২৭ (১৩৩৪), জ্যৈষ্ঠ

৮. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৯১

৯. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম.সি. সরকার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৮৪

১০. *প্রগতি, মাসিকী,* জ্যৈষ্ঠ - ১৩৩৫

১১. *প্রগতি* - আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য

১২. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার যৌবন, আত্মজৈবনিক*, বাতিঘর প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: আশ্বিন ১৪২৫, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৯০

১৩. তদেব, পৃ. ৯০